এই সময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

অধিকার লাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার প্রয়োগকে সংযত করিতে হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জলাঞ্জলি

জল নিয়ে ফের অগ্নিগর্ভ কর্নাটক। হিংসাত্মক সংঘর্ষে বেঙ্গালুরুতে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে সারা শহর জুড়ে। সুপ্রিম কোর্ট কর্নাটককে কাবেরী নদীর ১২০০০ কিউসেক জল তামিলনাড়ুকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া মাত্র পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। সমস্যা জটিল। এবং দীর্ঘমেয়াদি। সেটি সত্য। কিন্তু সেটি স্বীকার করলেও কর্নাটকে জনগণের একাংশের এই প্রতিক্রিয়া কোনও পরিস্থিতিতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কাবেরী নদীর জলবণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকের মধ্যে বিবাদ ১২৫ বছর পুরনো। কাজেই হিংসার মাধ্যমে জনজীবন স্তব্ধ করে দিয়ে রাত পোহালেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন কল্পনা করাও বাতুলতা। সঠিক ভাবেই রাজ্য সরকার কঠোর হাতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুবা এই বিক্ষোভ বেঙ্গালুরু শহর ও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কন্নড়ভাষী ও তামিলভাষী মানুষের মধ্যে সংঘর্ষে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। কাবেরীর জলবণ্টন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে কেউ ক্ষুব্ধ হতেই পারেন এবং সে বিষয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হওয়ার অধিকারও গণতন্ত্রে স্বীকৃত। কিন্তু বিক্ষোভ এবং হিংসার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন-রেখা রয়েছে। বাস্তব এটাই যে বেঙ্গালুরুতে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখা গেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ধরনের উন্মাদনার পিছনে যে একটি সংগঠিত উদ্যোগ কাজ করে তা ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে সোশাল মিডিয়া সাইটগুলিকেও গুজব রটানোর কাজে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। গণতন্ত্রে নাগরিকদের ক্ষমতায়নে সোশাল মিডিয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও এ ধরনের কিছু ক্ষেত্রে কী ভাবে তার ব্যবহারে অধিকতর দায়িত্বশীলতা আনা যায় সে বিষয়ে গণপরিসরে আরও চর্চা প্রয়োজন।

বিক্ষোভের নামে হিংসা নিন্দনীয় ঠিকই, কিন্তু তার পাশাপাশি কর্নাটকের কৃষকদের ক্ষোভের কারণগুলিও অনুধাবন করা প্রয়োজন। কাবেরী অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর পর দু' বছরের টানা অনাবৃষ্টি ক্লিষ্ট। কাজেই বাঁধগুলি থেকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যকে জল দেওয়ার নির্দেশে তাঁদের আশঙ্কার কারণ অনুমেয়। সমস্যা শুধু দু' রাজ্যের মধ্যে জলবণ্টনই নয়। আরও মৌলিক সমস্যা হল জলসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার। ভূগর্ভস্থ জলের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে যে রাজস্থানের মতো ঊষর জমিতেও চাষ-আবাদ সম্ভব তা প্রমাণিত। কাজেই দু' রাজ্যের কৃষকদের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি জলবণ্টন সমঝোতার পাশাপাশি জলসম্পদের ব্যবহারের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করতে একটি দীর্ঘমেয়াদি করিকল্পনাও জরুরি।

ভেজাল

প্রতি পাঁচবারে অন্তত একবার মানুষ ক্যানবন্দি সামুদ্রিক খাবার যে নাম দেখে খরিদ করেন সেটি পান না। ওশেনিয়ায় সামুদ্রিক প্রাণ সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত গবেষক এবং পরিবেশ কর্মীরা প্রায় পঁচিশ হাজার নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কুড়ি শতাংশ মানুষ কৌটোর গায়ে নানা রংচং দেওয়া প্রক্রিয়াজাত সে শ্রেণির খাবার খেয়ে ফেললে প্রাণে মরার আশঙ্কা নেই— পরিবেশে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ব্যাপারটি অন্য প্রসঙ্গ— যদিও বিজাতীয় স্বাদ খুঁজে ফেরার বিপদসঙ্কুল উপত্যকায় দিকভ্রষ্টদের ঘুরে বেড়ানোটিও যথেষ্ট দুঃখজনক ঘটনা। মুশকিল হল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি এই মুহূর্তে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেখানে চেনা মাছ এবং অপরিচিত অক্টোপাস স্কুইড ইত্যাদির মাঝে বহু উপাদান সাধারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় ঢুকে পড়েছে যার সম্বন্ধে প্রায় কেউই কিছু জানে না। পচনশীল খাদ্যবস্তুকে বহুকাল তাজা রাখার জন্য কোন ধরনের 'কেমিক্যাল' প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সম্বন্ধে ক্রেতার কোনও ধারণা নেই। ফলে ক্রেতা যখন ভাবছেন তিনি তাজা মাছ কিনছেন, তখন তিনি আসলে কিনছেন ফরমালিন। ফরমালিন ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক। ফরমালিন ছাড়াও আরও নানা ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য। এই সমস্যা শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের। ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ উদ্যোগী। কিন্তু এই শিল্পের বিকাশ যেন মানুষের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে না হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের তালিকা প্রকাশ করা এবং তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বাম নেতৃত্ব বোঝেননি, কৃষককে বলপূর্বক জমি থেকে উৎখাত করে রাজ্যে বেকারত্ব দূর করা যায় না

শিল্পের নয়, শিল্পায়নের বিকল্প পথ খোঁজা জরুরি

উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচির একটি স্পষ্ট রূপরেখা প্রয়োজন। এবং সেটির জন্য শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধি ও বিকাশ জরুরি। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই পথ দেখাতে পারবেন কি? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

অজিত নাইনান

গত ৩১ অগস্ট, সুপ্রিম কোর্ট, সিঙ্গুর মামলায় ২০৪ পৃষ্ঠার রায়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বাম আমলে, সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ ছিল 'অবৈধ' এবং রাজ্য সরকারকে বারো সপ্তাহের মধ্যে ওই প্রকল্পে সমস্ত ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক জমির মালিকদের নির্দিষ্ট জমি ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন (রায়ের নির্দেশনামা ১০৫-১০৬ নম্বর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এহেন অবস্থায় সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করে নিল যে সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে এবং যা ১৮৯৪ সালের মান্ধাতার আমলের জমি অধিগ্রহণ আইন বলবৎ করার জন্যই হয়েছিল। বাম শরিকরাও এত দিন চুপ করে থেকে এখন পুরো দোষ সিপিআই(এম)-এর ঘাড়ে চাপিয়ে বেসুরো গাইছেন। এমতাবস্থায় সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য দলীয় মুখপত্রে কিছুটা আত্মপক্ষ সমর্থন করে ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বামেদের ভরাডুবির অভিযোগ থেকে বাঁচানোর জন্য এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি এক দিকে যেমন রাজ্যে শাসক দল কর্তৃক সিঙ্গুর উৎসবের নামে 'জমি হাঙরদের সহর্ষ আস্ফালন'-এর আশঙ্কা করেছেন তেমন যথার্থ রূপে বিশিল্পায়নের নীতির বদলে শিল্পায়নের নীতি অনুসরণ করতে বড়ো, মাঝারি ও ছোটো শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কথা বলেছেন।

রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের কোনও বিকল্প নেই। সিঙ্গুরে বামেদের সেই উদ্দেশ্য যে ছিল না তা জোর করে বলা যায় না। প্রশ্ন ছিল জমি নেওয়ার পদ্ধতি ঘিরে যা সুপ্রিম কোর্টের রায়েও স্পষ্ট। ২০০৬-২০০৮ সালের মধ্যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রীর অনেক গঠনমূলক সমালোচনা ও বিকল্প ইতিবাচক প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী। বামফ্রন্টের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, সিঙ্গুর সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'কৃষক সভা কী করছে'? সেই কথায় কর্ণপাত না করে, উল্টে এক প্রবীণ কৃষক নেতা (যিনি সিঙ্গুর আন্দোলন পর্বে মহিলাদের নিয়ে কটু কথা বলার জন্য ভর্ৎসিত হন), এক বাম অর্থনীতিবিদের সঙ্গে বিতর্কে, দলের ইংরেজি মুখপত্রে (পিপলস ডেমোক্রেসি), লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক নীতির কথা উল্লেখ করে সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছিলেন। তখন মুরুব্বিদের সদুপদেশ না মেনে যে পার্টিকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে এই কথা এখনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনসমক্ষে স্বীকার করলেন না।

রাজ্যে বেকারত্ব মিটিয়ে এক 'নয়া বাংলা' গড়তে সরকারকে ২০১৩ সালের নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে শিল্পের জন্য সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত গড়ে সরকারের জমি অধিগ্রহণ করা উচিত। বড়ো কারখানার জন্য বহু ফসলি জমির তুলনায়, রুক্ষ ও এক ফসলি জমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে চাষ-আবাদের জন্য অযোগ্য বা এক ফসলি কৃষিজমির পাশাপাশি, বন্ধ কলকারখানার জমিও শনাক্ত করা দরকার। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার, জমি ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্সকে দিয়ে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে ২৩টি বন্ধ কারখানায় প্রায় ২৯,৫৫০ একর জমি, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আবাসন শিল্প গড়ে কিছু স্বল্পমেয়াদি কাজের তুলনায় নতুন শিল্পের জন্য (যাতে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান হয়) বন্ধ কারখানার জমিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সরকার একটা ভালো আইন করে অন্তত তিনটি বিষয় সুনিশ্চিত করতে পারেন। প্রথমত, বন্ধ কল-কারখানার মালিককে সরকারি মধ্যস্থতায় অন্য শিল্পপতিকে জমি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাতে ওই জমিতে নতুন কারখানা গড়া যায়। দ্বিতীয়ত, বন্ধ কারখানার মালিককে সরকারি মধ্যস্থতায় উৎসুক শিল্পপতিকে নতুন কারখানার জন্য জমি বিক্রি করার জন্য রাজি করানো। তৃতীয়ত, বন্ধ কারখানার মালিককে সরকারি সাহায্যের মাধ্যমে কারখানা খোলার ব্যবস্থা করা।

> বড়ো কারখানার জন্য বহু ফসলি জমির তুলনায়, রুক্ষ ও এক ফসলি জমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ অযোগ্য বা এক ফসলি কৃষিজমির পাশাপাশি, বন্ধ কলকারখানার জমিও শনাক্ত করা দরকার।

রাজ্যে এক অভূতপূর্ব কৃষি সঙ্কট চলছে। তাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকের কাছে ফসল কিনে সরকার, কয়েক টাকা মুনাফার বিনিময়ে, পাইকারি বাজারে সেই ফসল বেচতে পারে। এর ফলে রাজকোষে কিছু অতিরিক্ত [illegible] খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে খুব বেশি জমির প্রয়োজন হয় না। মালদায় আম চাষ হয়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরে লিচু-পেয়ারা সহ আরও অনেক ফল চাষ হয়। সেই ফল অন্য রাজ্যে চলে যায় ফলের শরবত তৈরি হতে। সেই ফলের শরবত বিদেশে রফতানি হয়, আবার দেশের অন্য প্রান্তে যায়। ফলের শরবত কারখানা না করে শুধু ক্রেতা হয়ে রাজ্যবাসী সেই শরবত কিনে খায়। এই রকম আর ক'দিন চলবে?

রাজ্যে দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষ অনেক ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে। সে দিকে লক্ষ্য রেখে দলিত, আদিবাসী ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নতুন রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহ, শৌচালয়, বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্কুল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো গড়ার দিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই মৌলিক পরিকাঠামো গড়ার মধ্য দিয়ে গ্রামে কিছু কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। চিটফান্ড রুখতে এক দিকে সরকারকে জোরদার প্রচার করা আর অন্য দিকে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গড়ার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

বাম আমলে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে ও নাগরিক জীবনে সরকার ও পার্টির হস্তক্ষেপ হয়েছিল, তৃণমূল জমানায় কিন্তু ওই চিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং বহু ক্ষেত্রে ওই সমস্যা আরও গভীর হয়েছে। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিগুলোর পাশে এক দিকে যেমন সরকারকে দাঁড়াতে হবে তেমনই সরকারকে বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন পেশার মানুষের জন্য সরকারি সাহায্য ও কল্যাণকর অনুদানের ব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠা ও পুরুষ এবং নারী শ্রমিকের সমান মজুরির দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় এবং রাজ্য মন্ত্রিসভায় যথাসম্ভব, দলিত, আদিবাসী, মহিলা ও মুসলিম সংখ্যালঘু মানুষের যেন এক সম্মানজনক প্রতিনিধিত্ব থাকে সে দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সমস্ত উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে ও সরকারি চাকরিতে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থনৈতিক উৎপাদনের তুলনায় রাজ্য সরকারের করের ভাগ, দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশ কম। কয়েকটা ক্ষেত্রে নতুন কিছু কর যেমন সরকার লাগু করতে পারে (যেমন কেরালা ও বিহারে অস্বাস্থ্যকর খাবারের উপর 'ফ্যাট ট্যাক্স' বসিয়েছে) তেমন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য থেকে সংগৃহীত সমস্ত কেন্দ্রীয় করের অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ দাবি করতে হবে। ভবিষ্যতে, এই বিষয়ে তীব্র লড়াই আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এগুলো কি বর্তমান সরকার করতে পারবে? করতে পারলে আগামী পাঁচ বছরে শাসক দলের ভিত আরও মজবুত হবে। না পারলে, বিরোধীরা ওই দাবিগুলো নিয়ে যদি পরের আঠারো মাস বৃহত্তর গণআন্দোলন করে তা হলে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা আশানুরূপ ফল পেতে পারে।

বুদ্ধিজীবীদের কাজ হল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থান থেকে সৃজনশীল বক্তব্য স্পষ্ট করে বলা। বাম আমলের শেষ পাঁচ বছরে কিছু ব্যক্তি (সমালোচকদের ভাষায় 'বুদ্ধজীবী') তারস্বরে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন এখন দিব্যি ভোল পাল্টেছেন। কিন্তু এই দুই তরফের থেকে ভিন্ন, এক শ্রেণির স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরাও আছেন। এই স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী জোটকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ গণতন্ত্রের পক্ষে এক শক্তিশালী বিরোধী শক্তি থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ওই স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের একাংশের একটি বিশেষ নির্বাচনে, বিরোধী জোটকে সমর্থন করার মানে এই নয় যে বাম আমলের কিছু অনাচার ও অত্যাচারকেও তারা সমর্থন করেন।

সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক, তাঁর প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেন যে 'সারদা-নারদ, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, জমির দালালি আর মাফিয়াবৃত্তির পথ, পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের পথ। ক্রমবর্ধমান বেকার বাহিনীকে লুম্পেনবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার পথ'। উনি যোগ করতে পারতেন যে মার্কস-এর ভাষায় কৃষককে বলপূর্বক জমি থেকে উৎখাত করাও 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের পথ'। উর্বর জমি অধিগ্রহণ করে 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়' ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব ছিল কারণ সেই সময় সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ছিল না। অন্য দিকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান চিন ও ভিয়েতনামে প্রায় একদলীয় শাসনব্যবস্থার জন্য চাষির জমি অধিগ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ভারতের মতো দেশে যেখানে বিরোধী দলের ছড়াছড়ি ও জনসাধারণের ভোটাধিকার আছে, সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ বা বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন ও ভিয়েতনামকে অন্ধ ভাবে নকল করতে গেলে হিতে বিপরীত হবেই। পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটা আনুষ্ঠানিক জমায়েত ছাড়া লাগাতার বৃহত্তর গণ-আন্দোলন সংগঠিত করতে বামেরা গত পাঁচ বছরে ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফল হল শাসক দলের কর্তৃত্ববাদ এবং দূরদর্শী উন্নয়নের মডেলের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তারা ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেছে। তাই আগামী পাঁচ বছর, বামেরা শ্রমিক-কৃষক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের' বিরুদ্ধে যদি লাগাতার বৃহত্তর গণ-আন্দোলন করে তা হলে খেটে-খাওয়া মানুষের অবশ্যই সমর্থন ও সাধুবাদ পাবেন।

সিঙ্গুর-ছায়া

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

নির্মলাক্ষর অনিবার্য কারণে আজ প্রকাশিত হল না